بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ জানুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক ১৭ সুলাহ্, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বিগত কয়েক খুতবায় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছে, আজ আমি এর অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করব।

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর আনসাররা নিজেদের মধ্য হতে যাদের খলীফা নির্বাচন করার আকাঙ্খা রাখতেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে তার নামও উল্লেখ করা হয়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহের (রা.)ও সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে লিখেছেন, আনসারদের তাকে খলীফা নির্বাচন করার (প্রতি) জোর দিচ্ছিল আর তিনি জাতির নেতাও ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন খলীফা নির্বাচিত হন তখন তিনি বরং এরও পূর্বে আনসারদের কথায় তিনি কিছুটা দোদুল্যমানও হয়ে পড়েছিলেন যে, তারই (খলীফা) হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন এবং এর বরাতে খিলাফতের মর্যাদার গুরুত্বও বর্ণনা করেছেন। কাজেই আমি এই বিবরণকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এটি সময়ের দাবিও বটে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র বরাত টানার পূর্বে হাদীস এবং একটি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করব।

হুমায়েদ বিন আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের সময় হযরত আবু বকর (রা.) মদীনা মুনাওয়ারার আশপাশে কোথাও ছিলেন। ফিরে আসার পর তিনি মহানবী (সা.)-এর মুখমণ্ডল হতে কাপড় সরিয়ে তাঁর পবিত্র চেহারায় চুমু খান এবং বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, আপনি জীবিতাবস্থায় এবং মৃত অবস্থায় কতইনা পবিত্র। এরপর বলেন, কাবা'র প্রভুর কসম! মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ত্বরিত গতিতে সাকীফাহ্ বনু সায়েদাহ্'র অভিমুখে যাত্রা করেন। তারা উভয়ে সেখানে পৌঁছার পর হযরত আবু বকর (রা.) আলোচনা আরম্ভ করেন। আনসারদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছুই তিনি বাদ দেন নি এবং মহানবী (সা.) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন তার সবই তিনি বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেন, তোমরা জান, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, যদি মানুষ একটি উপত্যকায় হাঁটে আর আনসাররা অন্য উপত্যকায়, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকায় হাঁটব। এরপর হযরত সা'দ (রা.)-কে সম্বোধন করে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে সা'দ! তুমি জান, তুমি উপবিষ্ট ছিলে যখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, খিলাফত লাভের অধিকার হবে কুরাইশদের। মানুষের মধ্যে যারা পুণ্যবান তারা কুরাইশদের পুণ্যবান ব্যক্তিদের অধীনস্থ হবে আর যারা পাপাচারি তারা কুরাইশদের পাপাচারীদের অনুসারী হবে। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আপনি সত্য বলেছেন, আমরা উযীর বা সাহায্যকারী আর আপনারা আমীর বা নির্দেশদাতা। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এর হাদীস। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৫৮, মুসনাদ আবী বকর সিদ্দিক, হাদীস নং: ১৮, কায়রোর দারুল হাদীস থেকে ১৯৯৪ সনে প্রকাশিত)**

তাবকাতুল কুবরায় এ ঘটনার বিবরণ এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র কাছে সংবাদ পাঠান, যেন তিনি এসে বয়আত করেন, কেননা লোকজন বয়আত করে নিয়েছে আর তোমার স্বজাতিও বয়আত করেছে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বয়আত করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার তূণে রক্ষিত সব তির লোকজনের প্রতি নিক্ষেপ না করব, অর্থাৎ তার বক্তব্য অনুসারে তিনি (বয়আত করতে) অস্বীকার করেন, আর আমার জাতি এবং স্বগোত্রীয়দের মধ্যে যারা আমার অনুসারী, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করব। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এই সংবাদ পান তখন বশীর বিন সা'দ (রা.) বলেন, হে মহানবী (সা.)-এর খলীফা! তিনি অস্বীকার করেছেন এবং হঠকারিতা প্রদর্শন করেছেন, অর্থাৎ অস্বীকারের ওপর জোর দিচ্ছেন, তাকে হত্যা করা হলেও তিনি আপনার হাতে বয়আত করবেন না। আর তাকে ততক্ষণ হত্যা করা সম্ভব নয় যতক্ষণ তার সাথে তার সন্তানাদি এবং তার গোত্রকে হত্যা না করা হবে। আর খাযরাজ গোত্রকে হত্যা না করা পর্যন্ত আদৌ এদেরকে হত্যা করা সম্ভব নয়। আর খাযরাজকে ততক্ষণ হত্যা করা সম্ভব নয় যতক্ষণ অওস গোত্রকে হত্যা না করা হবে। অতএব আপনি তাদের প্রতি অগ্রসর হবেন না, কেননা এখন মানুষের জন্য বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি আপনার ক্ষতি করতে পারবেন না। অর্থাৎ তার জাতির অধিকাংশ সদস্য বয়আত করে নিয়েছে, তিনি অস্বীকার করলেও এটি তেমন কোন বিষয় নয়, কেননা তিনি এমন এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তি যাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বশীর (রা.)'র পরামর্শ গ্রহণ করে হযরত সা'দ (রা.)-কে উপেক্ষা করেন।

এরপর যখন হযরত উমর (রা.) খলীফা হন তখন একদিন মদীনার রাস্তায় সা'দ-(রা.)'র এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, হে সা'দ! কিছু বল। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হে উমর (রা.)! আপনিই বলুন অর্থাৎ তাদের মাঝে বাক্য বিনিময় হয়। হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি কি তেমনই আছ যেমনটি পূর্বে ছিল? হযরত সা'দ বলেন, হ্যাঁ, আমি তেমনই আছি। আপনি খিলাফত লাভ করেছেন, ঠিক আছে, আপনি খিলাফত লাভ করেছেন ঠিকই, অনেক মানুষ (আপনার হাতে) বয়আতও করেছে, কিন্তু আমি এখনও বয়আত করি নি। এরপর তিনি বলেন, খোদার কসম! আপনার সঙ্গী অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের কাছে আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন– এ কথা হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন। এরপর হযরত সা'দ (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমার দিবসের সূচনা এমন অবস্থায় হয়েছে যে, আমি আপনার প্রতিবেশী হওয়াকে ঘৃণা করি। হযরত উমর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গ অপছন্দ করে সে যেন তার কাছ থেকে প্রস্থান করে। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমি এটি ভুলব না। অর্থাৎ আমি এটি অবশ্যই করব। আমি এমন প্রতিবেশীর সঙ্গ অবলম্বন করতে যাচ্ছি যে আপনার চেয়ে উত্তম, অর্থাৎ তার ধারণা এটি। এর কিছুকাল যেতেই হযরত সা'দ হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতের সূচনাতেই সিরিয়ায় হিজরত করেন। এটি তাবকাতুল কুবরা'র উদ্বৃতি।

(আত্ তাবকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, সা'দ বিন উবাদাহ্, পৃ: ৩১২, লেবাননের বৈরুতস্থ দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরাবী থেকে ১৯৯২ সনে প্রকাশিত)

হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কে এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত করেছিলেন। অতএব, তাবরী'র ইতিহাসে লিখা আছে,

"ওয়াত্তাবাআল ক্বওমু আলাল বায়আতি ওয়া বায়াআ সা'দ"। অর্থাৎ পুরো জাতি পালাক্রমে হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত করে আর হযরত সা'দও বয়আত করেন। এটি তাবরী'র ইতিহাস গ্রন্থের উদ্বৃতি।

(তারীখুত তাবারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬২২, সুনহে এহদা আশারা যিকরুল খাবরে আম্মা জারিউন বাইনাল মুহাজিরীন, ২০০২ সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিস্তারিত যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে অনেক বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, খিলাফতের (হাতে) বয়আত করা কেন আবশ্যক, খিলাফতের মর্যাদা কী, আর হযরত সা'দ (রা.) যা কিছু করেছেন তার গুরুত্ব কী?

তিনি (রা.) তাঁর এক খুতবায় বলেন, "'ক্বতল' শব্দের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদও হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর সাহাবীদের মাঝে যখন খিলাফত সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয় তখন আনসারদের ধারণা ছিল খিলাফত আমাদের অধিকার, আমরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন খলীফা হলে আনসারদের মধ্য থেকেও একজন (খলীফা) হওয়া উচিত। অর্থাৎ, দু'জন (খলীফা) হবেন। বনু হাশেম মনে করে, খিলাফত আমাদের অধিকার। মহানবী (সা.) আমাদের বংশের ছিলেন। মুহাজিরগণ যদিও চাচ্ছিলেন, খলীফা কুরাইশদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত, কেননা আরবরা কুরাইশ ছাড়া অন্য কারো কথা মানতে প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু তারা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে উপস্থাপন করতে পারে নি, বরং (খলীফা) মনোনয়নের বিষয়টিকে নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন যে, নির্বাচন হোক– মুসলমানরা যাকে নির্বাচিত করবে তাকেই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে খলীফা গণ্য করা হবে। তারা যখন এই ধারণা ব্যক্ত করে তখন আনসার এবং বনু হাশেম– সবাই তাদের সাথে একমত হয়, কিন্তু একজন সাহাবী এই বিষয়টি বুঝতে পারেন নি। তিনি ছিলেন সেই আনসারী সাহাবী, যাকে আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে খলীফা বানাতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি হয়ত এই বিষয়টিকে নিজের জন্য অসম্মানের কারণ মনে করেছেন বা এই বিষয়টি তিনি বুঝতেই পারেন নি– কারণ যা-ই হোক না কেন, তিনি বলে দেন, আমি আবু বকরের হাতে বয়আত করতে প্রস্তুত নই। এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)'র একটি উক্তি কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, **'উকতুলূ সা'দ'** অর্থাৎ সা'দকে হত্যা কর। কিন্তু তিনি নিজেও তাকে হত্যা করেন নি আর অন্যরাও (হত্যা) করে নি। কোন কোন ভাষাবিদ লিখেন, হযরত উমর (রা.) শুধু এতটুকু বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তোমরা সা'দ-এর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থে এটিও লেখা আছে যে, হযরত সা'দ (রা.) নিয়মিত মসজিদে আসতেন এবং পৃথকভাবে নামায পড়ে চলে যেতেন, আর কোন সাহাবী তার সাথে কোন কথা বলতেন না। অতএব, 'ক্বতল' শব্দের অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা আর জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেও বুঝায়।" **(খুতবাতে মাহমুদ, ষষ্ঠদশ খণ্ড, পৃঃ ৮১-৮২, জুমুআর খুতবা ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) সংক্রান্ত ঘটনা আরো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। আর আমি প্রথমে যে উদ্ধৃতি পাঠ করেছি, সেই খুতবার বরাতে তিনি (রা.) বলেন, আমি ইতিপূর্বে এক খুতবায় একজন আনসারী সাহাবীর উল্লেখ করেছিলাম, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কতিপয় আনসার সাহাবী দাবি করেছিলেন যেন আনসারদের মধ্য থেকে খলীফা মনোনীত করা হয়। কিন্তু মুহাজিররা আর বিশেষভাবে হযরত আবু বকর (রা.) যখন সাহাবীদের বলেন, এ ধরনের নির্বাচন ইসলাম ধর্মের জন্য কখনোই কল্যাণজনক হতে পারে না আর মুসলমানরা এই নির্বাচনে আনসারদের কাউকে

নির্বাচিত করতে কখনো একমত হবে না, তখন আনসার ও মুহাজির উভয়ে এ বিষয়ে সহমত হয় এবং এতে ঐকমত্য হয় যে, তারা কোন মুহাজিরের হাতে-ই বয়আত গ্রহণ করবে। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.)'র বিষয়ে তারা সবাই একমত হয়। আনসারদের কারো ব্যাপারে সবার ঐকমত্য হওয়া সম্ভব ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করেন এবং আরো কতিপয় সাহাবীও এটি স্পষ্ট করেছেন, কেননা এটি কল্যাণকর হবে না। যাহোক, সিদ্ধান্ত হয়, মুহাজিরদের মধ্য থেকেই খলীফা হবেন। অতঃপর সবাই হযরত আবু বকর (রা.)-সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তখন বলেছিলাম, হযরত সা'দ (রা.) যখন বয়আত গ্রহণ করা হতে পিছপা হয়েছিলেন বা কিছুটা দ্বিধা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন হযরত উমর (রা.) বলেছিলেন, **'উকতুলূ সা'দ'** অর্থাৎ সা'দকে 'ক্বতল' বা হত্যা কর। কিন্তু তিনি (রা.) নিজেও সা'দকে হত্যা করেন নি আর অন্য কোন সাহাবীও তাকে হত্যা করে নি, বরং তিনি অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, যেমনটি পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে, এবং হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে তিনি সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হিজরত করেছিলেন এবং সিরিয়াতে ইহধাম ত্যাগ করেন। এর ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ইমামগণ এ যুক্তি দিয়েছেন যে, 'ক্বতল' শব্দের অর্থ এখানে আক্ষরিক হত্যা নয় বরং এর অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং আরবী ভাষায় 'ক্বতল' শব্দের অনেক অর্থ হয়। উর্দূ ভাষায় যদিও **'ক্বতল'** শব্দের অর্থ বাহ্যিক বা আক্ষরিক হত্যাকেই বুঝায় কিন্তু আরবী ভাষায় যখন **'ক্বতল'** শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন তা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেগুলোর একটি অর্থ হল, সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর ভাষাবিদগণ এ থেকে যে যুক্তি দাঁড় করেছেন তা হল, হযরত উমর (রা.) **'ক্বতল'** শব্দ দ্বারা আক্ষরিক হত্যা বুঝান নি বরং সম্পর্ক ছিন্ন করা বুঝিয়েছিলেন, অর্থাৎ তাকে পরিত্যাগ করা, তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়া। নতুবা যদি **'ক্বতল'** শব্দ দ্বারা আক্ষরিক হত্যা করাই বুঝানো হতো তাহলে হযরত উমর (রা.), যিনি খুবই রাগি স্বভাবের ছিলেন, নিজে কেন তাকে হত্যা করেন নি অথবা সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কেন তাকে হত্যা করল না? অধিকন্তু হযরত উমর (রা.) যে তাকে সে সময় হত্যা করেন নি– কেবল তা-ই নয় বরং নিজ খিলাফতকালেও তাকে হত্যা করেন নি। আর কারো কারো মতে হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালের পরও তিনি জীবিত ছিলেন আর কোন সাহাবী তার ওপর হাত তুলেন নি। যাহোক, এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, **'ক্বতল'** শব্দ দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন করাকেই বুঝানো হয়েছিল, বাহ্যিক বা আক্ষরিক হত্যা করা বুঝানো হয় নি। আর যদিও সেই সাহাবী (অর্থাৎ হযরত সা'দ) অন্য সাধারণ সাহাবীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোন সাহাবী তার ওপর হাত তুলেন নি।

অতএব, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম, স্বপ্নেও যদি কারো নিহত হওয়া দেখা হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা সম্পর্কচ্ছেদ এবং একঘরে করাও হতে পারে। হুযূর (রা.) এখানে নিজের এক খুতবার কথা উল্লেখ করছেন। যাহোক, এরপর তিনি (রা.) বলেন, এক বন্ধু আমাকে বলেছেন, এক ব্যক্তি সেই খুতবার পর বলেন, সা'দ যদিও বয়আত করেন নি কিন্তু তিনি পরামর্শ-সভায় যোগ দিতেন। অর্থাৎ বয়আত না করা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে পরামর্শ করার জন্য ডাকতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কে যে কথা বলেছে– এর দু'টো অর্থ হতে পারে। হয় সে আমার কৃত অর্থ প্রত্যাখ্যান করছে, অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ

(রা.) অভিধান থেকে **'ক্বতল'** শব্দের যে অর্থ তুলে ধরেছেন সেটি অগ্রাহ্য করছে। হয় সে আমার কৃত অর্থ প্রত্যাখ্যান করছে অথবা এমন কোন ঘটনাই ঘটে নি অথবা এটি (বলতে চাচ্ছে), খিলাফতের বয়আত না করা তেমন বড় কোন অপরাধ নয়। দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি একথা সাব্যস্ত করতে চায় যে, খিলাফতের বয়আত না করলেও তা কোন বড় অপরাধ নয়, কেননা সা'দ (রা.) বয়আত না করলেও পরামর্শ-সভায় যোগ দিতেন। তিনি (রা.) বলেন, কোন এক কবি বলেছেন,

تَا مَرد سُخَن نگُفتَه بَاشَد
عَيب وہُنَرش نَہُفتَه بَاشَد

(উচাচারণ: 'তা মারদ সুখান না গোফতে বশাদ, এ্যায়বো হুনরাশ না হুফতাহ্ বশাদ')

অর্থাৎ **'মানুষের দোষ-গুণ তার কথা বলার আগ পর্যন্ত গোপন থাকে। মানুষ যখন কথা বলে ফেলে তখন বহুবার নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়'**। চুপ থাকলে দুর্বলতা গোপন থাকে। অনেক সময় নির্বোধের মতো কথা বলে ফেলার কারণে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়। তিনি (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই ব্যাখ্যা করেছে, হযরত সা'দ (রা.) পরামর্শসভায় অংশগ্রহণ করতেন, অথবা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর খুতবা সম্পর্কে যে ব্যক্তি মন্তব্য করেছিল, তার কথা বলার অর্থ এটিই দাঁড়ায় যে, হয় সে খলীফার বয়আত করার গুরুত্বকে খাটো করে দেখাতে চায় অথবা নিজের জ্ঞান জাহির করতে চায়। কিন্তু এই উভয় রীতিই ভ্রান্ত। নিজের জ্ঞান জাহির করায় কোন লাভ নেই। কেননা এ বিষয়টি এতটাই ভুল যে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা শুনে না হেসে পারবে না। সাহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে ইসলামের ইতিহাসে তিনটি গ্রন্থ খুবই প্রসিদ্ধ এবং সাহাবীগণ সম্পর্কিত সকল ইতিহাস ঐ তিনটি গ্রন্থকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খেতে থাকে। আর সেগুলো হল- ***'তাহযীবুত্ তাহযীব'***, ***'ইসাবাহ্'*** এবং ***'উসদুল গাবাহ'***। এই তিনটি গ্রন্থের প্রত্যেকটিতেই এটি লিখা আছে যে, সা'দ অন্যান্য সাহাবী থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। কোন কোন অভিধান গ্রন্থেও **'ক্বতল'** শব্দটি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, আসল কথা হল, সাহাবীদের মাঝে ষাট-সত্তর জনের নাম সা'দ। তাদের মাঝে একজন হলেন, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), যিনি আশারায়ে মুবাশ্বারার (অর্থাৎ দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীর) একজন ছিলেন আর হযরত উমর (রা.)'র পক্ষ থেকে কমাণ্ডার ইন চীফ বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন আর সকল পরামর্শসভায় যোগ দিতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র খুতবা সম্পর্কে যে ব্যক্তি আপত্তি করেছিল সে হয়ত জ্ঞান-স্বল্পতার কারণে সা'দ শব্দটি শোনার পর এটি বুঝতে পারে নি যে, এই সা'দ এক ব্যক্তি আর সেই সা'দ ভিন্ন ব্যক্তি, বরং সে কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই আমার খুতবার সমালোচনা করে বসেছে। এখানে আমি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র কথা বলি নি, যিনি মুহাজির ছিলেন বরং আমি যার কথা বলেছি, তিনি আনসারী ছিলেন। এ দু'জন ছাড়া আরো অনেক সা'দ আছেন, বরং ষাট-সত্তর জনের মতো সা'দ আছেন। আমি যে সা'দের উল্লেখ করেছি তার পুরো নাম ছিল সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)। আসলে আরবদের মাঝে নাম অনেক কম হতো আর সাধারণত একেকটি গ্রামে একই নামের কয়েকজন থাকত। যখন কারো উল্লেখ করতে হতো, তখন তার পিতার নামে তার উল্লেখ করা হতো। যেমন- কেবল সা'দ বা সাঈদ বলা হতো না বরং সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) অথবা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলা হতো। পিতার নামে না চেনা

গেলে, সেক্ষেত্রে তার স্থায়ী ঠিকানার উল্লেখ করা হতো। আর যেখানে স্থানের উল্লেখ করলেও চেনা যেত না, সেক্ষেত্রে তার গোত্রের নাম উল্লেখ করা হতো। যেমন, এক সা'দ সম্পর্কে ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তার নাম যেহেতু অন্যদের নামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল তাই ঐতিহাসিকগণ তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, আমাদের বলার উদ্দেশ্য অওস গোত্রের সা'দ অথবা খাযরাজ গোত্রের সা'দ। সেই ভদ্রলোকের অর্থাৎ আপত্তিকারী বা মন্তব্যকারী ব্যক্তির কথায় মনে হয়, তিনি নামের ভিন্নতার বিষয়টি বুঝতে না পেরে অনর্থক আপত্তি করে বসেছেন। কিন্তু এমন বিষয়সমূহ মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হয় না বরং অজ্ঞতার পর্দা বিদীর্ণ করে থাকে।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, খিলাফত এমন এক নিয়ামত যার সাথে বিচ্ছিন্নতা মানুষকে কোন সম্মানের অধিকারী করতে পারে না। তিনি (রা.) বলেন, যেখানে তিনি (রা.) খুতবা প্রদান করছিলেন সেটি সম্ভবত মসজিদে আকসা ছিল, এই মসজিদেই আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (রা.) বলেছিলেন, তোমরা কি জানো! প্রথম খলীফার শত্রু কে ছিল? এরপর নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, কুরআন পাঠ করলে তোমরা জানতে পারবে, তাঁর শত্রু ছিল 'ইবলিস'। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা খলীফা মনোনীত করেন আর তাঁর শত্রু ছিল ইবলিস। এরপর তিনি (রা.) অর্থাৎ, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, **'আমিও খলীফা আর যে ব্যক্তি আমার শত্রু সেও ইবলিস'**।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খলীফা প্রত্যাদিষ্ট হন না। যদিও তার প্রত্যাদিষ্ট না হওয়াও আবশ্যক নয়। হযরত আদম (আ.) প্রত্যাদিষ্টও ছিলেন আবার খলীফাও ছিলেন। হযরত দাঊদ (আ.) প্রত্যাদিষ্টও ছিলেন আবার খলীফাও ছিলেন। আর একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রত্যাদিষ্টও ছিলেন আবার খলীফাও ছিলেন। এছাড়া সকল নবীই প্রত্যাদিষ্টও হয়ে থাকেন আবার খোদা মনোনীত খলীফাও হন। যেভাবে এক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মানুষই খলীফা ঠিক সেভাবে নবীগণও খলীফা হয়ে থাকেন। কিন্তু এমন খলীফাও হয়ে থাকেন যারা কখনোই প্রত্যাদিষ্ট হন না। যদিও আনুগত্যের দিক থেকে তাদের আনুগত্য করা এবং নবীগণের আনুগত্য করার মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। যেভাবে নবীর আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে থাকে ঠিক একইভাবে খলীফাদের আনুগত্যও অপরিহার্য। তবে হ্যাঁ! এই দুই আনুগত্যের মাঝে একটি পার্থক্য ও ভিন্নতা রয়েছে আর তা হল, নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ করার কারণ– তিনি ঐশী বাণী ও পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন। কিন্তু খলীফার আনুগত্য এজন্য করা হয় না যে, তিনি ঐশী বাণী ও সকল পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু; বরং এজন্য করা হয় যে, তিনি হলেন ঐশী বাণীর বাস্তবায়ন ও সকল ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ নবীর প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তার বাস্তবায়নকারী। আর নবী যে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা পরিচালনার কেন্দ্র হচ্ছেন খলীফা। এজন্য জ্ঞানী এবং বিজ্ঞরা বলে থাকেন, নবীগণের **'ইসমতে কুবরা'** (অর্থাৎ বড় বা মহান সুরক্ষা) লাভ হয়ে থাকে এবং খলীফাগণের **'ইসমতে সুগরা'** (অর্থাৎ ছোট বা সাধারণ সুরক্ষা) লাভ হয়ে থাকে। এই মসজিদেই [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কাদিয়ানের যে মসজিদে এই খুতবা প্রদান করছিলেন] এবং এই মিম্বরে জুমুআর দিনেই আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (রা.) বলেন, **তোমরা আমার কোন ব্যক্তিগত কাজে ত্রুটি দেখিয়ে এই আনুগত্যের বাইরে যেতে পার না**। আমার কোন

ব্যক্তিগত কাজে যদি কোন ত্রুটি খুঁজে পাও তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, আনুগত্য করা থেকে তোমরা মুক্তি পেয়ে গেছ। তোমাদের প্রতি খোদা যা অর্পণ করেছেন (তা থেকে) কখনোই মুক্ত হতে পারবে না। তোমাদের ওপর খোদা তা'লা যে আনুগত্যের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা থেকে তোমরা মুক্ত হতে পার না। কেননা আমি যে কাজের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি তা ভিন্ন একটি কাজ আর তা হল, নিযাম বা ব্যবস্থাপনার ঐক্য ও দৃঢ়তা। তাই আমার আনুগত্য করা জরুরী ও আবশ্যক। অতএব নবীদের সম্পর্কে যেখানে ঐশী নীতি হল, মানবীয় দুর্বলতা ছাড়া তৌহীদ ও রিসালতের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা এতে হস্তক্ষেপ করেন না আর উম্মতের তরবীয়তের জন্যও তা আবশ্যক হয়ে থাকে, যেমন– **সিজদায়ে সাহু;** এটি ভুলে গেলে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর একটি উদ্দেশ্য হল, উম্মতকে **সাহুর** রীতি সম্পর্কে ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া। এ ধরণের ভ্রান্তি নবীরাও করতে পারেন, মহানবী (সা.)-এর দ্বারাও সংঘটিত হয়েছে আর তিনি (সা.) এরপর সিজদায়ে সাহুও দিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, নবীদের সমস্ত কর্মকাণ্ড খোদা তা'লার নিরাপত্তার গণ্ডিতে থাকে অপরদিকে খলীফাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার রীতি হল, জামা'তের উন্নতির জন্য কৃত তাদের সমস্ত কাজ খোদা তা'লার সুরক্ষার অধীনে সম্পন্ন হবে এবং তারা কখনো এমন কোন ভুল করবেন না আর করলেও তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন না, যা জামা'তের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী এবং ইসলামের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরকারী হবে। তিনি অর্থাৎ যুগ-খলীফা জামা'তের দৃঢ়তা এবং ইসলামকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য যে পদক্ষেপই গ্রহণ করবেন- খোদা তা'লা প্রদত্ত সুরক্ষা তার সাথে থাকবে। আর তারা যদি কখনো ভুল করেও বসেন তাহলে তার সংশোধনের দায়িত্ব স্বয়ং খোদা তা'লার। এক কথায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত খলীফাদের সকল কর্মকাণ্ডের দায়দায়িত্ব খলীফার নয় বরং খোদার। এ কারণেই বলা হয়, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং খলীফা মনোনীত করেন। এর অর্থ এটি নয় যে, তিনি অর্থাৎ খলীফা ভুল করতে পারেন না, বরং এর অর্থ হল, হয় তাদের কথা কিংবা কাজের মাধ্যমেই খোদা তা'লা সেই ভ্রান্তির সংশোধন করে দিবেন অথবা যদি তাদের কথা বা কর্মদ্বারা ভুলের সংশোধন না করিয়ে থাকেন তাহলে সেই ভুলের অশুভ পরিণমাকে বদলে দিবেন, অর্থাৎ এর মন্দ প্রভাব প্রকাশিত হবে না।

তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞার অধীনে খলীফারা যদি কখনো এমন কোন কথা বলে বসেন যার পরিণাম বাহ্যত মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর এবং যার ফলে বাহ্যত জামা'ত সম্পর্কে আশঙ্কা হবে যে, উন্নতির পরিবর্তে তা অবনতির দিকে যাবে, সেক্ষেত্রে খোদা তা'লা একান্ত অদৃশ্য উপকরণের মাধ্যমে সেই ভ্রান্তির ফলাফল পরিবর্তন করে দিবেন এবং জামা'ত অধঃপতনের পরিবর্তে উন্নতির পানে অগ্রসর হবে। আর সেই সুপ্ত প্রজ্ঞাও পূর্ণ হবে যার কারণে খলীফার হৃদয়ে অজ্ঞতা দানা বেঁধেছিল, অর্থাৎ কোন ভুল হয়ে গিয়েছিল অথবা কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেই হিকমত বা প্রজ্ঞাও পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু নবীগণ এই উভয় বিষয়ই লাভ করে থাকেন, **'ইসমতে কুবরা'** (অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের সুরক্ষা) এবং **'ইসমতে সুগরা'ও** (অর্থাৎ সাধারণ পর্যায়ের সুরক্ষা); তারা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমেরও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন এবং ওহী (ঐশীবাণী) ও কর্মের পবিত্রতারও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন। কিন্তু একথার অর্থ এটি নয় যে, প্রত্যেক খলীফা আমল বা কর্মের পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু হবেন না। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, কর্মের পবিত্রতার সাথে সম্পৃক্ত কিছু কাজের ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য ওলীদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হবেন। অতএব, একদিকে যেখানে এরূপ খলীফা থাকতে পারেন যারা কর্মের পবিত্রতারও কেন্দ্রবিন্দু এবং ব্যবস্থাপনারও কেন্দ্রবিন্দু, অন্যদিকে

এমন খলীফাও থাকতে পারেন যারা পবিত্রতা ও নৈকট্যের দিক থেকে অন্যদের তুলনায় নিম্নমানের হবেন, কিন্তু ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত যোগ্যতার নিরিখে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে থাকবেন; কিন্তু সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের জন্য তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক, কেননা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জামা'তী রাজনীতির সাথে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক রয়েছে।

এখন 'জামা'তী রাজনীতি' কথাটি শুনে সবাই হয়ত চমকে উঠেছেন। কেউ কেউ হয়ত ভাবছেন– এই 'জামা'তী রাজনীতি' আবার কী? এখানে 'রাজনীতি' শব্দটি সচরাচর আমাদের ভাষায়, ভাষায় আবার কী? আমাদের এখানে সাধারণত যে অর্থ করা হয় তা নেতিবাচক অর্থেই করা হয় এবং নেতিবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কতিপয় রাজনীতিবিদ এই শব্দটিকে দুর্নাম করে রেখেছে অর্থাৎ কারসাজি করা, ক্ষতি করা বা সঠিক কাজ না করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিধানে এর যে অর্থ রয়েছে তা হল, ব্যবস্থাপনা পরিচালনার পদ্ধতি; সুচারুরূপে ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকে রাজনীতি বলা হয়। আবার প্রজ্ঞা ও কৌশলের সাথে কাজ করাও এর একটি অর্থ। মন্দকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করাও এর একটি অর্থ। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে কার্য পরিচালনা করা, আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সুচারুরূপে সম্পাদনের যোগ্যতা থাকা– এগুলো হল প্রকৃত রাজনীতি। এক কথায় সমস্ত ইতিবাচক বিষয় এই শব্দের অর্থের অন্তর্গত। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, দুর্ভাগ্যবশত আমরা এর প্রকৃত অর্থ ভুলে গিয়ে রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডের দরুন এবং নিজেদেরই ভ্রান্ত কার্যকলাপের কারণে এর নেতিবাচক অর্থ গ্রহণ করে থাকি। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে রাজনীতি শব্দটি ইতিবাচক অর্থেই ব্যবহার করেছেন এবং আমি যে কথাগুলো উল্লেখ করেছি, সেসব কথার অর্থ হল, ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত।

তিনি (রা.) বলেন, যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জামা'তী রাজনীতির সাথে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক থাকে তাই খলীফাদের ক্ষেত্রে মুখ্য যে বিষয় দেখা হয় তা হল, তারা যেন ব্যবস্থাপনার দিকটিকে অগ্রগণ্য রাখেন, ব্যবস্থাপনাকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। তিনি (রা.) এর পাশাপাশি এখানে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, যদিও এর পাশাপাশি ধর্মের দৃঢ়তা এবং এর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকেও দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। যুগ-খলীফার জন্য জামা'তী ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করাও আবশ্যক এবং একইভাবে ধর্মের দৃঢ়তা ও একে সুপ্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টিও দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে যেখানে খিলাফতের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে বলেছেন, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ (সূরা আন্ নূর: ৫৬) খোদা তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করবেন এবং একে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করবেন।

অতএব, খলীফাগণ যে ধর্ম উপস্থাপন করেন তা খোদা তা'লার হিফাযত বা সুরক্ষাধীন থাকে। কিন্তু এটি **'হিফাযতে সুগরা'** (অর্থাৎ সাধারণ পর্যায়ের সুরক্ষা) হয়ে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, খুঁটিনাটি বিষয়ে বা শাখা-উপশাখায় তারা ভুল করতে পারেন এবং খলীফাদের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্যও থাকতে পারে, কিন্তু তা অতি তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয় হয়ে থাকে। যেমন, কোন কোন বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)'র মধ্যে মতপার্থক্য ছিল; এমনকি আজও উম্মতে মুহাম্মদীয়া উক্ত বিষয়াদিতে এক ও অভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করতে পারে নি। কিন্তু এই মতপার্থক্য শুধুমাত্র ছোটখাটো বিষয়ে হয়ে থাকে, নীতিগত বিষয়ে তাদের মাঝে কখনো কোন মতভেদ হবে না। বরং এর বিপরীতে তাদের মধ্যেও ঐক্য

থাকবে এবং তাঁরা অর্থাৎ খলীফাগণ পৃথিবীর হিদায়াতদাতা, পথপ্রদর্শনকারী এবং একে আলোদানকারী হবেন। অতএব একথা বলা যে, কোন ব্যক্তি বয়আত গ্রহণ না করেও সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে যে মর্যাদায় বয়আত গ্রহণকারী অধিষ্ঠিত রয়েছে- এমন কথা প্রমাণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে বুঝে-ই না যে, বয়আত এবং ব্যবস্থাপনা কী জিনিস।

পরামর্শ সম্পর্কেও স্মরণ রাখতে হবে, একজন অভিজ্ঞ এবং কোন বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি, সে যদি ভিন্নধর্মীও হয়, তার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি মামলায় একজন ইংরেজ উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, তিনি নবুয়্যতের ব্যাপারেও তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। আহযাবের যুদ্ধের সময়ে মহানবী (সা.) হযরত সালমান ফারসী (রা.)'র পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের দেশে যুদ্ধের সময় কী করা হয়? তিনি বলেন, আমাদের দেশে পরিখা খনন করা হয়। তিনি (সা.) বললেন, এটি অতি উত্তম পরামর্শ। অতএব পরিখা খনন করা হয় আর এজন্য একে পরিখার যুদ্ধও বলা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, হযরত সালমান ফারসী (রা.) রণকৌশলে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে অধিক পারদর্শী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) রণকৌশলে যে দক্ষতা রাখতেন তার (অর্থাৎ সালমান ফারসীর) সেই যোগ্যতা কোথায়? অথবা মহানবী (সা.) যেসব কাজ করেছেন তা হযরত সালমান ফারসী (রা.) কবে করেছেন? বরং খলীফাদের যুগেও হযরত সালমান ফারসী (রা.)'কে কোন বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয় নি; অথচ তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। কাজেই, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্নধর্মী হলেও তার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। অতঃপর তিনি (রা.) নিজের কথা বর্ণনা করে বলেন, আমি যখন অসুস্থ ছিলাম তখন ইংরেজ ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়েছি; কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, খিলাফতের বিষয়েও আমি তাদের পরামর্শ নিয়েছি অথবা নিয়ে থাকি অথবা তাদেরকে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের মতো মর্যাদার অধিকারী জ্ঞান করি। সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেই এর অর্থ এই নয় যে, সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া আর অন্যদের পরামর্শ নেয়া একই কথা। সাহাবীদের মর্যাদা অবশ্যই উন্নত। তিনি (রা.) বলেন, বরং এর অর্থ শুধু এতটুকু যে, আমি চিকিৎসাশাস্ত্রের পরামর্শ নিয়েছি। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, একটি নির্দিষ্ট বিভাগ সম্পর্কে পরামর্শ নিয়েছি বা কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য পরামর্শ নিয়েছি। অতএব, (তর্কের খাতিরে) ধরে নাও, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র কাছ থেকে কোন পার্থিব বিষয়ে, যাতে তিনি দক্ষতা রাখতেন, পরামর্শ নেয়া যদি সাব্যস্তও হয়; তবুও এ কথা বলা যেতে পারে না যে, তিনি পরামর্শে অংশ নিতেন। কিন্তু তার সম্পর্কে এরূপ কোন সহীহ হাদীস নেই যাতে এ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি পরামর্শ-সভাগুলোতে অংশ নিতেন। বরং সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে এটিই সাব্যস্ত হয় যে, তিনি মদীনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। সাহাবীদের ধারণা ছিল, তিনি ইসলামী কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এজন্যই তার মৃত্যুতে সাহাবীদের কথিত উক্তি আছে যে, ফিরিশ্তা বা জিন্রা তাকে মেরে ফেলেছে– যা দ্বারা সাব্যস্ত হয়, সাহাবীগণ তার মৃত্যু সম্পর্কেও ভালো ধারণা রাখতেন না। এমনিতে তো প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফিরিশতারাই মৃত্যু দিয়ে থাকে কিন্তু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বিশেষভাবে একথা বলা যে, ফিরিশতা বা জিনরা তাকে মৃত্যু দিয়েছে– এটি থেকে প্রমাণিত হয়, তাদের মতে তার মৃত্যু এমনভাবে হয়েছে যে, খোদা তা'লা স্বীয় বিশেষ পন্থায় তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন যেন তিনি বিভেদের কারণ না হন। অর্থাৎ তিনি যেহেতু বদরী সাহাবী ছিলেন, তাই কোন

প্রকার কপটতা বা বিরোধিতা বা এরূপ কোন বিষয়ের কারণ যেন না হন যার মাধ্যমে তার সেই মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। যাহোক, তিনি পৃথক হয়ে যান।

এ কথা বর্ণনা করার পর তিনি (রা.) বলেন, এসব রেওয়ায়েত সাব্যস্ত করে, তিনি এক সময় যে সম্মান অর্জন করেছিলেন সেই মর্যাদার নিরিখে পরবর্তীতে সাহাবীদের হৃদয়ে তার প্রতি সেই সম্মান ছিল না। অধিকন্তু সাহাবীগণ তার প্রতি সন্তুষ্টও ছিলেন না, নতুবা তারা কীভাবে একথা বলতে পারতেন যে, ফিরিশ্‌তা বা জিন্নরা তাকে মৃত্যু দিয়েছে। বরং তার মৃত্যু সম্পর্কে এর চেয়েও কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা আমি মুখে আনতে চাই না।

অতএব, খিলাফতের বয়আত করা ছাড়াও মানুষ ইসলামী ব্যবস্থাপনায় স্বীয় মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারে– এমন ধারণা পোষণ করা বাস্তব ঘটনাবলী ও ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরে এরূপ ধারণা পোষণ করে, সে বয়আতের মর্ম সামান্যও বুঝে বলে আমার মনে হয় না। **(খুতবাতে মাহমুদ, ষষ্ঠদশ খণ্ড, পৃ: ৯৫-১০১, জুমুআর খুতবা ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫)**

হযরত উমর (রা.)'র খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আড়াই বছর পরে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) সিরিয়ার হুরান নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী'র মতে, সিরিয়ার বুসরা নগরীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এটি ছিল মুসলমানদের জয় করা সিরিয়ার প্রথম নগরী। মদীনাতে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে নি তাহলে কীভাবে জানা গেল (তিনি মারা গেছেন)? বর্ণিত আছে, মদীনাতে যেভাবে তাঁর মৃত্যু সংবাদ এসেছে তা হল, একবার দুপুরের তীব্র দাবদাহের সময় মুনাব্বেহ্ কূপ বা সাকান কূপে লম্ফঝম্প করা ছেলেদের একজন কূপ থেকে কাউকে একথা বলতে শুনে যে,

قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة

ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده

(উচ্চারণ: **'ক্বাদ কাতালনা সাইয়্যেদাল খাযরাজে সা'দাবনা উবাদাহ্, ওয়া রামাইনাহু বিসাহমায়নি ফালাম নুখত্বী ফুআদাহ্'**।) অর্থাৎ **'আমরা খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদাহ্‌কে হত্যা করেছি; আমরা তাকে দু'টি তির মেরেছি; আমরা তার বক্ষভেদ করতে ব্যর্থ হইনি'**। ছেলেরা ভয় পেয়ে যায় এবং মানুষ সে দিনটিকে স্মরণ রাখে। এ ঘটনা সেদিনই ঘটে যেদিন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র মৃত্যু হয়েছিল। সা'দ (রা.) বসে প্রস্রাব করছিলেন; এমতাবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। হযরত উমর (রা.)'র যুগে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী ১৪ হিজরীতে আর কোন কোন বর্ণনানুসারে ১৫ হিজরীতে আবার কারো কারো মতে ১৬ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। দামেস্কের অদূরে নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত মানীহাহ্ নামক গ্রামে হযরত সা'দ (রা.)'র কবর অবস্থিত; এটি তাবকাতুল কুবরার উদ্ধৃতি।

(আত্ তাবকাতুল কুবরা লে-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৩, সা'দ বিন উবাদাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১২ সনে মুদ্রিত), (আল্ ইসাবাহ্ ফী তাম্‌য়ীযিস্ সাহাবাহ্ লে ইবনে হাজর আসকালানী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সনে মুদ্রিত), (আল ইস্তেয়াবু ফী মা'রিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪, সা'দ বিন উবাদাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সনে মুদ্রিত)

এরপর এখন আমি দু'জন প্রয়াতের স্মৃতিচারণ করব এবং তাদের জানাযাও পড়াব, ইনাশাআল্লাহ্। প্রথমজন হলেন, জনাব সৈয়্যদ মুহাম্মদ সরওয়ার শাহ্ সাহেব যিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের সদস্য ছিলেন। গত ৮ জানুয়ারি, ৮৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। বিগত কিছুকাল যাবৎ তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত সাহস, ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে তিনি রোগের মুকাবিলা করেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজ দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন। অসুস্থতাকে কখনোই তিনি তার (কাজে) বাধ সাধতে দেন নি। তিনি উড়িষ্যা রাজ্যের সুঙ্গড়া গ্রামের সুপরিচিত ও নিষ্ঠাবান আহমদী পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার বড় নানা হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রহীম সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন আর নানা মরহুম মুকাররম মৌলভী আব্দুল আলীম সাহেব একজন প্রসিদ্ধ ধর্মীয় আলেম ও কবি ছিলেন। তার জন্মের পর তার পিতা নিজ শ্বশুরের কাছে নাম রাখার আবেদন করলে তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে সৈয়্যদ সরওয়ার শাহ্ সাহেবকে আমাদের বাড়িতে আসতে দেখেছি, তাই তার নামও সৈয়্যদ সরওয়ার রেখে দাও। কটক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি বি.এ পাস করেন, এরপর প্রাইভেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, এরপর উড়িষ্যা হাইকোর্টে সহকারী হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে অডিট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং অবসর গ্রহণের পর ১৯৯৫ সনে জামা'তের সেবার জন্য তিনি নিজেকে ওয়াক্ফ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৯৬ সনে তার ওপর কতক দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাকে এর ইনচার্জ নিযুক্ত করেন। তিনি ওমরা করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কেন্দ্রীয় অডিটর এবং বিভিন্ন বিষয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের দায়িত্বও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার ওপর অর্পণ করেন আর তিনি শেষ পর্যন্ত সেই অডিট কর্মকর্তা হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছিলেন। এছাড়া মরহুম নয় বছর পর্যন্ত কাযা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে তিনি প্রেসিডেন্ট এবং সদস্যও ছিলেন আর আমৃত্যু সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদস্য থাকারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল অতি উন্নত মানের। যেমনটি আমি বলেছি, দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় অডিটর হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, আপনি খুব ভালো কাজ করছেন, জাযাকুমুল্লাহ্ আহসানাল জাযা। আপনার নির্ভয়ে সত্য বলার রীতি আমার খুব ভালো লেগেছে। মাশাআল্লাহ্ অনেক সূক্ষ্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ আপনার দৃষ্টিগোচর হয়। আপনি এভাবেই নিজ পরিকল্পনা অনুসারে আপনার কাজ করতে থাকুন আর কেউ এক্ষেত্রে আপনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। আল্লাহ্ আপনাকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দিন। {তখন তিনি (রাহে.) তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়াও করেন।}

কাদিয়ানের কাযা বোর্ডের নাযেম সাহেব বর্ণনা করেন, কাযা বোর্ডের সকল কর্মীর সাথে তার গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন মামলাসমূহের যথাসম্ভব দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টা করতেন। তিনি অত্যন্ত সতকর্তার সাথে মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা করতেন। ন্যায়বিচার ভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। সুচিন্তিত ও সঠিক মত প্রকাশ করতেন আর স্পর্শকাতর বিষয়াদিতে আল্লাহ্ তা'লার কাছে নির্দেশনা যাচনা করতেন।

তার জামাতা কাদিয়ানের নূর হাসপাতালের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডাক্তার তারেক সাহেব বলেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়াও সময়মতো মসজিদে মোবারকে গিয়ে নামায আদায় করতেন। হাত-পা যখন কাঁপতে শুরু করে আর সঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না, তখনও অন্যদের সাহায্য নিয়ে মসজিদে যেতেন। জুমুআর নামাযে সময়মতো গিয়ে সর্বদা প্রথম সারিতে বসতেন। মাগরিবের নামাযের পর থেকে ইশা পর্যন্ত মসজিদে বসে নফল, দোয়া এবং বিভিন্ন তসবীহ্ পাঠে মগ্ন থাকতেন।

কাদিয়ানের নাযেরে আলা সাহেবও লিখেছেন, তিনি বহুগুণাবলীর আধার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিশুক, অতিথিপরায়ণ ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। নিজের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি পরম অনুগত এবং আজ্ঞাবহ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক সম্পর্ক ছিল এবং অন্যদেরও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম মূসী ছিলেন এবং তার সকল ছেলে-মেয়ে সাগ্রহে জামা'তী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। তার ছোট ছেলে সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ সাহেব কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট হিসেবে সেবা প্রদান করছেন। তার উভয় জামাতা সৈয়্যদ তানভীর আহমদ সাহেব এবং ডাক্তার তারেক আহমদ সাহেব ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী। তারা কাদিয়ানে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। একইভাবে তার ছোট জামাতা সৈয়্যদ হাসান খান সাহেবও অবসর গ্রহণের পর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জামাতের সেবা করছেন।

যতদিন পর্যন্ত মরহুম সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব নাযেরে আলা ছিলেন, সর্বদা শিষ্ঠাচারের গণ্ডিরভুক্ত থেকে অডিট করেন এবং তাকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাবলী জিজ্ঞেস করতেন। তিনি বলতেন, পুরো কাদিয়ানে মিয়াঁ সাহেবের মতো স্নেহশীল আর কেউ ছিল না। দারুল মসীহ্‌তে বসবাস করতেন আর হযরত মিয়াঁ সাহেব তার অনেক খোঁজ-খবর রাখতেন। অনেক সময় তার স্নেহ-ভালোবাসার কথা স্মরণ করে শাহ্ সাহেব কেঁদে ফেলতেন। কাদিয়ানের দরবেশদের (তিনি) গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তিনি নিজেও পরম বিনয়ের সাথে দরবেশদের মতো জীবন কাটিয়েছেন। জামেয়ার ছাত্রদের সাথেও গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। আলেমদের অনেক সম্মান করতেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় যে জানাযা পড়া হবে সেটি হল, রাবওয়ার ডাক্তার লতীফ আহমদ কুরাইশী সাহেবের সহধর্মিণী এবং প্রয়াত মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কন্যা মোহতরমা শওকত গওহর সাহেবার। গত ৫ জানুয়ারি, ৭৭ বছর বয়সে তিনি রাবওয়ায় মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনিও মুসী ছিলেন। তিনি আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন আর তখন তাঁর পিতা মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব সেখানে মুরব্বী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি পিতামাতার সাথে হায়দ্রাবাদ দক্ষিণে বসবাস আরম্ভ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা করাচীতে স্থানান্তরিত হন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি করাচীতেই লাভ করেন এবং পড়াশোনায় অত্যন্ত চৌকস ছিলেন, সবসময় প্রথম স্থান অধিকার করতেন। খুব অল্প বয়স থেকেই জামা'তের সেবার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। নাসেরাতদের সেক্রেটারি হওয়ার পর করাচীর নাসেরাতদেরকে তিনি প্রথম সারিতে নিয়ে আসেন। ১৯৬১ সনে ডাক্তার লতীফ কুরাইশী সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়, তখন তিনি মেডিকেল কলেজে পড়ছিলেন। এরপর তিনি (অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব) যুক্তরাজ্যে চলে আসলে স্বামীর সাথে

তিনিও এখানে চলে আসেন। এখানে পড়াশোনা সম্পন্ন করার পর ডাক্তার সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কে অবহিত করলে হুযূর তাকে বলেন, আপনি পাকিস্তানে চলে আসুন আর (তিনি) তাকে ফযলে ওমর হাসপাতালে নিযুক্ত করেন। মরহুমাও তখন সানন্দে নিজের স্বামীর সাথে রাবওয়ায় গিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেন আর জামা'তেরও অনেক কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। সেখানে তিনি লাজনার অনেক কাজ করেছেন। তাঁর যুগে রাবওয়ায় বসবাসকারী প্রত্যেক মেয়ে ও মহিলা তার সেবা সম্পর্কে অবহিত থাকবে।

আমার মাতা সাহেবযাদী নাসেরা বেগম সাহেবা যখন লাজনা ইমাইল্লাহ্, রাবওয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন তিনি তাকে মজলিসে আমেলার জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত করেছিলেন আর ১৫ বৎসর তিনি সেই দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তার কাছ থেকেই তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এরপর অতি উন্নত প্রশাসনিক দক্ষতার সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় আমেলাতেও সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন। তারপর আমি তাকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত করেছিলাম। ৬ বৎসর পর্যন্ত সেখানেও তিনি উন্নত মানের সেবা প্রদান করেছেন। অসুস্থতার কারণে তাকে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র দায়িত্ব ছাড়তে হয়, কিন্তু তবুও যখনই সুযোগ পেতেন কোন না কোনভাবে কাজ করতেন। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন বিভাগে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার সাথে কাজ করেছেন এমন প্রত্যেক নারী ও মেয়ে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার, দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য, অতিথি আপ্যায়ন, চাঁদা প্রদানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আর প্রথম সুযোগেই চাঁদা প্রদান করা– এ সবই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। বরং এ বছরও ওয়াকফে জাদীদ এর চাঁদার ঘোষণা প্রদান করা মাত্রই, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি তা পরিশোধ করে দেন। ৫ তারিখে তিনি মৃত্যু বরণ করেন আর ১ তারিখে ঘোষণার সাথে সাথেই তিনি চাঁদা পরিশোধ করে দেন।

ডাক্তার কুরাইশী সাহেব লিখেন, মরহুমা পঞ্চাশ বছরের দাম্পত্য জীবনে উত্তম সহধর্মিণী, উৎকৃষ্ট মা, উৎকৃষ্ট বোন ও উৎকৃষ্ট কন্যা হিসেবে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। একটি বিষয় এখানে হয়ত যিনি লিখছেন তিনি উল্লেখ করেন নি বা ডাক্তার সাহেব-ই বলেন নি যে, তিনি উত্তম পুত্রবধূও ছিলেন, ভুলে হয়ত বাদ পড়েছে। তার শ্বশুর-শাশুড়িও তাদের সাথেই ছিলেন, বরং এখনও বেঁচে আছেন এবং (তার) সাথেই ছিলেন। তিনি তাদের সেবা করেছেন, অসুস্থতার সময়ও শাশুড়ির সেবা-শুশ্রূষা করেছেন এবং নিজের মায়ের মতো তার যত্ন নেন। মোটকথা, তিনি এক আদর্শ জীবন যাপন করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। দীর্ঘ অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আগ্রহভরে বাড়ির কাজকর্মে অংশ নিতেন এবং তা সম্পন্ন করতেন। অসুস্থতার সময় কোন অনুযোগ-অভিযোগ মুখে আসে নি। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পীড়া সহ্য করেছেন। খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক ছিল। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি তার স্বামী ডাক্তার লতীফ কুরাইশী সাহেব ছাড়াও তিন ছেলে ও দু'মেয়ে রেখে গেছেন। আর দু'ছেলে ও এক মেয়ে ডাক্তার এবং আরেক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। তাদের সবাই উচ্চশিক্ষিত। অনেক প্রতিকূলতার মাঝে তিনি তাদেরকে পড়াশোনা করিয়েছেন। তার এক মেয়ে একবার তাকে প্রশ্ন করে, আপনি কখনো অলংকার পরিধান করেন না কেন, কোন ভালো পোশাক বানান না কেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি যে অর্থ সাশ্রয় করি, তা তোমাদের শিক্ষার পেছনে ব্যয় করি। আর আমি মনে করি, এটাই আমার অলংকার ও উন্নত পোশাক

যে, তোমরা উচ্চশিক্ষিত হবে এবং জামা'তের জন্য হিতৈষী সত্তায় পরিণত হবে আর একই সাথে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন ও দিব্য দর্শনের অভিজ্ঞতা রাখতেন। তার সন্তানরা লিখেছে, তার অনেক স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। এক মেয়ের ভর্তির সময় তিনি বলেছিলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি অমুক মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে আর সেখানেই সে ভর্তি হয়। অনুরূপভাবে তার আরো অসংখ্য স্বপ্ন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি অত্যন্ত পুণ্যবতী নারী ছিলেন এবং নিজের বোনদের প্রতিও অনেক যত্নবান ছিলেন।

তার ছেলে আব্দুল মালেক সাহেব লিখেছেন, তিনি নিঃস্বার্থভাবে জামা'তের সেবা করতেন। অনেকবার প্রচণ্ড গরমের মধ্যে লাজনা অফিস থেকে দারুল উলুম পর্যন্ত তিনি পায়ে হেঁটে এসেছেন কিন্তু কখনো একবারও অভিযোগ করেন নি। ঈদের সময় সর্বদা তিনি কাছের এবং দূরের প্রতিবেশীদের জন্য বাড়িতে মিষ্টান্ন বানিয়ে পাঠাতেন আর সব সময় এটি বলতেন, আমরা যদি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কখনো আমাদের বিনষ্ট করবেন না।

তার এক মেয়ে বলেন, বিয়ের পর যখন আমার সন্তানাদি হয়, যারা আমেরিকায় বসবাস করে, তিনি আমাকে সর্বদা উপদেশ দিতেন, আমেরিকা ও বহির্বিশ্বের সামগ্রিক মন্দ পরিবেশ থেকে রক্ষার জন্য নিজ সন্তানদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। বাড়ির পরিবেশ এমন বানাও যেন বাড়িতেই তাদের মন বসে এবং বাইরে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়িতেই বেশি সময় কাটায়।

এই মেয়ে আরো বলেন, আহমদী হওয়ার কারণে একবার মেডিকেল কলেজের মেয়েরা আমার বিরোধিতা করে ও আমাকে বয়কট করে। আমি তখন আমার মাকে ফোন করে কাঁদতে থাকি। তখন তিনি আমাকে অতি উত্তমভাবে উপদেশ দেন এবং বলেন, এতে কান্নার কী আছে, এটিতো নবীদের সুন্নত, যার ওপর চলার সুযোগ তুমি লাভ করেছ। তিনি আরো বলেন, একথা লিখে রাখ, আহমদীয়াতের কারণে তোমার যদি কোন কষ্ট হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে কখনো বিনষ্ট করবেন না আর পরীক্ষায়ও তুমি সফল হবে। তিনি বলেন, আমি শুধু পরীক্ষাতে সফলই হই নি বরং সেই দুষ্টু মেয়েদের সবাই অকৃতকার্য হয়।

আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। তারা যেন নেক, সালেহ (পুণ্যবান) এবং ধর্মের সেবক হয় আর খিলাফতের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকে ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখে।

যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পরে আমি তাদের উভয়ের গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)